প্রতিবেদন

চিংড়ি রফতানি

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়

● শুভ্র শচীন

'সাদা সোনা' খ্যাত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হিমায়িত চিংড়ি রফতানি শিল্প বর্তমানে নানামুখী সঙ্কটে। দেশে বর্তমানে যে কটি হিমায়িত চিংড়ি রফতানিকারক কোম্পানি চালু আছে, তাদের বছরে চাহিদা প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মেট্রিক টন। অথচ এর বিপরীতে সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ হাজার মেট্রিক টন। চিংড়িসহ বিভিন্ন সঙ্কটে ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধেক হিমায়িত প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

অপরদিকে চিংড়িতে নাইট্রোফোরান (অ্যান্টিবায়োটিক) ইস্যু ও মান নিয়ন্ত্রণের (কোয়ালিটি কন্ট্রোল) দেয়া সার্টিফিকেট টেম্পারিংয়ের দায়ে অভিযুক্ত রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে জরিমানা ও লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছে। চিংড়ি রফতানিকারকরা এ জন্য সরাসরি মৎস্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের নতুন অধ্যাদেশকে (অর্ডিন্যান্স) দায়ী করছেন। তারা অবিলম্বে অর্ডিন্যান্সের সংশোধন এনে এ শিল্পকে রক্ষার দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এস. হুমায়ুন কবীর জানান, সারা দেশে লাইসেন্সকৃত হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানা রয়েছে ৯০টি। এর মধ্যে চালু আছে ৪০টির মতো। খুলনায় ৫০টির মধ্যে ৩৫ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৫টি চালু আছে। বাকি কারখানাগুলো চিংড়ির অভাব, ব্যবস্থাপনার সঙ্কট ও অর্থনৈতিক কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

তিনি জানান, আমাদের দেশে হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ২৫০০ কেজি থেকে ৩০০ কেজি। বাংলাদেশে চিংড়ি উৎপাদন এত কম হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি জানান, এখনো আমাদের দেশের অনেক চাষি সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করছে। এছাড়া ব্যাংক ঋণ না পাওয়া এবং ঋণ পেলেও সময়মতো না পাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশে চিংড়ি চাষ হচ্ছে না।

রফতানিযোগ্য হিমায়িত চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ : খুলনা অঞ্চলে রফতানিযোগ্য হিমায়িত চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করে ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

খুলনা মৎস্য অধিদপ্তরের (মান নিয়ন্ত্রণ) উপ-পরিচালক মো. আবদুর রাশেদ দেশে বর্তমানে চিংড়ি চাষ কমে যাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, কিছু অসৎ লোভী কারখানা মালিক, ডিপো মালিক ও মাছ সরবরাহকারী চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করে বিশ্ববাজারে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করছে। গত বছর পুশের কারণে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা ও ৭ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়। এছাড়া গত বছর বেশ কটি হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানাকে ১৯ লাখ টাকা জরিমানা ও ৪টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত করা হয়। এ বছর ইতিমধ্যে কয়েকটি কারখানাকে ৯ লাখ টাকা জরিমানা ও ২টি কারখানার লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ঘেরগুলো থেকে গলদা অথবা বাগদা চিংড়ি কোম্পানিতে আসার পর প্রতি মণে ওয়াটার লেস (পানির ওজন কম) ৫০০ গ্রাম কম, পাল্লায় ফের ২০০ গ্রাম এবং বাস্কেটে (ঝুড়িতে) ওজন কম ২০০ গ্রামসহ মোট এক কেজি কম ধরা হয়। ফলে বিক্রেতাকে এক মণ চিংড়িতে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা লোকসান দিতে হয়। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীরা ঘের থেকে যখন চিংড়ি কেনেন, তখন তাকে এক মণের দামই দিতে হয়। এই লোকসান ঠেকাতে তারা মাছে অপদ্রব্য পুশ করেন। তবে এখন অসাধু ব্যবসায়ীরা ওজন কম ঠেকাতে নয়, অধিক লাভের আশায় চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করে চলেছে।

ব্যবসায়ীদের সূত্রে আরো জানা যায়, খুলনা অঞ্চলের হিমায়িত চিংড়ি রফতানির প্রায় সব প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি খুলনায়। কোম্পানিগুলো খুলনা জেলার রূপসা উপজেলায়ই অবস্থিত। এখানে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জ এলাকা থেকে চিংড়ি আসে। চিংড়িগুলো সরাসরি কোম্পানিতে না যাওয়ায় তা রাখা হয় ডিপোতে। সেখানেই রাতের আঁধারে লাখ লাখ টাকার চিংড়িতে 'আগার পাউডার' পুশ করা হয় যা চিংড়ির মাংসের সঙ্গে মিশে যায়। ডিপো ছাড়া ঘের থেকেও চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করার অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে রূপসা চিংড়ি বণিক সমিতির সভাপতি আমিন মোল্লা বলেন, ১-২টি কোম্পানি অপদ্রব্য পুশ করা চিংড়ি গ্রহণ করে। তারা অপদ্রব্য পুশ করা চিংড়ি বাদ দিলেই তা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

বছরে কোটি টাকা ইন্সপেক্টরদের পকেটে : রফতানিমুখী এই শিল্পে স্বস্তিতে নেই রফতানিকারকরা। চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণ করে বেঁধে দেয়া সময়সীমায় বিদেশে মাছ পাঠাতে নানা হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। রফতানির আগে বাধ্যতামূলক মাইক্রো বায়োলজি ও কেমিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট পেতে অহেতুক দীর্ঘসূত্রতায় হয়রানি তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে রয়েছে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পরিদর্শকদের উৎকোচসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার দাবি।

সূত্র জানিয়েছে, কোম্পানি পরিদর্শনের সময় ইন্সপেক্টরদের কমপক্ষে তিন হাজার টাকা দিতে হয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বা উৎসবে-পার্বণে এর পরিমাণ বেড়ে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। প্রতি মাসে গড়ে দেড় শতাধিক ইন্সপেকশন হয় কোম্পানিগুলোতে। সে হিসাবে মাসে গড়ে সাত লাখ এবং বছরে প্রায় কোটি টাকা পকেটে ভরছেন ইন্সপেক্টররা। খুলনার মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অফিসে ১০ জন ইন্সপেক্টর রয়েছেন। তাদের মধ্যে পরিদর্শক মো. আলাউদ্দিন মোল্লা, গোলাম মোস্তফা, তরিকুল ইসলাম, মনিরুল মামুন, জিএম সেলিম, তৌফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ পদে চাকরি সূত্রে তারা প্রচুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে গোটা মৎস্য বিভাগেই প্রচার রয়েছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে সিনিয়র পরিদর্শক মো. আলাউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আবেদনের সঙ্গে নির্ধারিত ফি ট্রেজারি চালান বা ডিডির মাধ্যমে কোম্পানিগুলো জমা দেয়। ইন্সপেক্টররা কোনো বাড়তি অর্থ নেন না। আসা-যাওয়া বা কোম্পানির পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হয়, সেটা জেনারেল কার্টেসি। একে উৎকোচ মনে করার কারণ নেই।

মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবদুর রাশেদ জানান, নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হলে রিপোর্ট পেতে কিছুটা সময় লাগতো। তবে এখন খুলনাতেই এলাইজা মেশিন চালু হয়েছে। ফলে রিপোর্টের জন্য আর ঢাকায় যেতে হবে না। শুধু কেমিক্যাল টেস্টে পজিটিভ রিপোর্ট হলে এলসিএমএসএমএস পরীক্ষার প্রয়োজনে ঢাকা পাঠাতে হবে। ফলে কোম্পানিগুলো এখন মাত্র ৭ দিনেই তাদের সার্টিফিকেট পাবে। ইন্সপেক্টরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্দেশ দেয়া আছে, তারা ইন্সপেকশনের জন্য অফিসের কাছ থেকে বিল পাবে। কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নেবে না। তবে কেউ কেউ ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ওদের গাড়ি ব্যবহার করে। এটা বন্ধ করা হবে। ■